গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ অক্টোবর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

বেসরকারি হাতে রেল প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ট্রেন বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ২৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, এটা দেশের জনগণের উপর এক মারাত্মক আঘাত। এর ফলে রেলযাত্রা আরও ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াবে এবং লক্ষ লক্ষ রেল কর্মচারী ছাঁটাই হবেন। শুধু তাই নয়, এই কর্মচারীরা তাঁদের বহু সংগ্রামে অর্জিত নানা সুবিধা ও অধিকারগুলিও হারাবেন। এই ভয়ঙ্কর নির্দেশে আসলে সমগ্র রেল ব্যবস্থা বেসরকারিকরণের চক্রান্তের প্রথম ধাপ।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যাতে এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়, তার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

রেকর্ড রাজস্ব মদে খুশি সরকার বিপন্ন নারী-নিরাপত্তা

এবার পুজোর আরম্ভেই রাজ্যের তৃণমূল সরকার এক 'ইতিহাস' গড়েছে। তার আবগারি বিভাগ একমাসে ১১০০ কোটি টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। আবগারির ইতিহাসে যা কখনওই ঘটেনি। তবে এমন একটি ইতিহাস সৃষ্টি একদিনে হয়নি। এর জন্য ধাপে ধাপে পরিকল্পিতভাবে এগোতে হয়েছে। পুজোর সময় মানুষ যখন আনন্দে মাতোয়ারা হয়, তখন যাতে কোনও অনিষ্ট বা দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য সরকারি নির্দেশে পুজোর দিনগুলোতে মদের দোকানগুলি বন্ধ রাখা হত। ২০১৬ সাল থেকে সরকারি নির্দেশে পুজোর চারদিনই দোকান খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। পরের বছরই সরকার রাজ্যের অর্থদপ্তরের অধীনে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজ কর্পোরেশন লিমিটেড' নামে একটা কোম্পানি খুলে রাজ্য জুড়ে মদের গোটা পাইকারি ব্যবসাটা হাতে তুলে নেয়। সেদিনই কোম্পানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল—'ইট স্ট্রাইভস টু আর্ন এনাফ ক্যাশ টু সাসটেন ইটস বিজনেস অ্যান্ড টু পে ডিভিডেন্ডস টু দ্য গভর্নমেন্ট'। অর্থাৎ, এই সরকারি কোম্পানির উদ্দেশ্য হল মদ বেচে প্রচুর টাকা কামিয়ে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া। জেলায় জেলায় ৩৫টি দেশীয় মদের ডিপো এবং ২৩টি বিদেশি মদের ডিপো খোলা হয়। খুচরো বিক্রেতারা আগাম দাম দিয়ে এখানে মদ কেনে। আবগারি আইনকে শিথিল করে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া এবং তার মাধ্যমে রাজস্বের আয় বাড়ানোর রাস্তাটি দেখিয়েছিল এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। তৃণমূল সরকার সেই পথেই হেঁটেছে এবং এই বছরের শুরুতে ঘোষণা করেছিল গ্রামে গ্রামে আরও ১২০০ নতুন দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। যদিও জেলায় জেলায় মানুষের সক্রিয় প্রতিরোধে তারা আপাতত তা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে।

আর একটি বিষয়েও এ রাজ্যের সরকার ইতিপূর্বেই ইতিহাস তৈরি করেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় এ রাজ্য প্রথম স্থানে। সকলেই জানেন

পাঁচের পাতায় দেখুন

মন্দায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি

জনস্বার্থ বলি দিয়ে পুঁজিপতিদের বাঁচাচ্ছে মোদি সরকার

এবার পুজো ভাল কাটেনি দুলাল দাসের। হাতিবাগান মার্কেটে জামাকাপড়ের ছোট দোকান তাঁর। বললেন, "বিক্রিবাটা কোথায়? এবার ভিড় দেখতে পেয়েছেন হাতিবাগানে? ওই ছুটির দিনগুলোতে যা একটু। অন্যান্য বার গার্ড রেল দিয়ে ভিড় সামলায় পুলিশ, এবার তার দরকারও পড়েনি।" এক ব্যাগ বিক্রেতা বললেন, "অন্য বার দিনে যদি তিনটে ব্যাগ বিক্রি হত, এবার হয়েছে একখানা। কিনবে কে, পয়সা কোথায় লোকের হাতে?"

বাস্তবিকই টাকা-পয়সা নেই বেশিরভাগ মানুষের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে জামাকাপড়ের সবচেয়ে বড় তিনটি পাইকারি বাজার— হরিসা হাট, মঙ্গলা হাট আর মেটিয়াবুরুজ— সর্বত্রই এই উৎসবের মরশুমেও ছিল কোনাকাটায় মন্দা। আগের তুলনায় বিক্রি তিন ভাগের একভাগ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জামাকাপড়ের মেলা 'তাঁতের হাট'-এর এক বিক্রেতা জানিয়েছেন, এ বছর বিক্রি প্রায় ৪০ শতাংশ কমে গেছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের আর্থিক পরিস্থিতি যে সঙ্গীন, গত কয়েক মাস ধরে খবরের কাগজ খুললেই তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। এবার আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা আইএমএফ-এর ম্যানেজিং

দুয়ের পাতায় দেখুন

যুবশ্রীদের গণকনভেনশন ও নবান্ন অভিযান

২৪ সেপ্টেম্বর। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে যুবশ্রীদের নবান্ন অভিযান। সংবাদ পাঁচের পাতায়

রেলে ব্যাপক বেসরকারিকরণ

জনগণের সর্বনাশ, কর্পোরেটের পৌষমাস

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে দ্রুত বিলগ্নীকরণ এবং বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। দেশের প্রধান সরকারি পরিবহণ সংস্থা ভারতীয় রেলের ওপর এই বেসরকারিকরণের কোপ কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হলেও এবারে বাজেটের পর নীতি আয়োগ এবং রেলমন্ত্রক ঘোষণা করেছে ৫০টি রেল স্টেশন এবং ১৫০টি দূরপাল্লার ট্রেন, আন্তঃশহর এক্সপ্রেস (ইন্টারসিটি) ও কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই, সেকেন্দ্রাবাদের লোকাল ট্রেন তারা কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবে। ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ-দিল্লি বেসরকারি বিলাসবহুল 'তেজস ট্রেন' চালু হয়েছে। উচ্ছ্বসিত যোগী আদিত্যনাথ তা উদ্বোধন করেছেন। যদিও রেলমন্ত্রী পীযূষ গয়াল তার মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তকে 'রেলে বেসরকারিকরণ হচ্ছে' বলে মানতে রাজি নন।

১১ জুলাই সংসদে রেল বাজেট সংক্রান্ত বিতর্কে বিরোধী সাংসদদের তিনি বলেছিলেন, 'রেলে কোনও বেসরকারিকরণ হচ্ছে না'। অথচ এবারের বাজেটে সরকার জানিয়ে দিয়েছে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ রেল কারখানাকে কর্পোরেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হবে। ইতিমধ্যে চেন্নাইয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে রেল কোচ তৈরির দায়িত্ব কর্পোরেট পুঁজিপতিদের দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। রেলমন্ত্রী বলেছেন, আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে লাইনপাতা, বৈদ্যুতীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি বেসরকারি কোম্পানিগুলির সাথে হাত মিলিয়ে পিপিপি মডেলে করা হবে। আগে থেকেই খাবার, সাফাই, টিকিট বিক্রি, ইন্টারনেট প্রভৃতি পরিষেবা বেসরকারি সংস্থার অধীনে। আয় বাড়ানোর জন্য রেলদপ্তরে থাকা জমি বিক্রির ব্যাপারেও

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিপতিদের বাঁচাচ্ছে মোদি সরকার

একের পাতার পর

ডিরেক্টরও মন্তব্য করেছেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে যে মন্দা চলছে, তার প্রকট প্রভাব দেখা যাচ্ছে ভারতে এবং এই মন্দা শিগগির কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দার গ্রাসের কথা বলেছে বিশ্বব্যাঙ্কও।

অবশ্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সহ মোদি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা তো বটেই, এমনকী সংঘ-প্রধান মোহন ভাগবত অবধি মন্দার কথা স্বীকার করা দূরের কথা, তা নিয়ে আলোচনাতেও রাজি নন। যদিও সরকারি পরিসংখ্যানগুলিতেই প্রকট অর্থনীতির চরম রুগ্ন চেহারা। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, গত ছ'বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন '১৯) ভারতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কমে নেমে এসেছে ৫ শতাংশে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ঘোষণা করেছে ২০১৯-'২০ আর্থিক বছরে বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার ৬.৯ শতাংশ থেকে কমে ৬.১ শতাংশ হয়ে যেতে পারে। সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, যে আটটি শিল্প নিয়ে দেশের শিল্প উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র তথা কোর সেক্টর গঠিত, সেই বিদ্যুৎ, ইস্পাত, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, কয়লা, সিমেন্ট, প্রাকৃতিক গ্যাস ও সারের উৎপাদন এ বছরের আগস্ট মাসে আগের বছরের এই সময়ের তুলনায় ০.৫ শতাংশ কমে গেছে। এই আটটি শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি অন্য শিল্পে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে কাজ করে। তাই এই শিল্পগুলিতে উৎপাদনের হার কমে যাওয়ার অর্থ, অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে এই উপাদানগুলির চাহিদা কমে যাওয়া। অর্থাৎ অন্যান্য শিল্পগুলিতেও উৎপাদনের পরিমাণ কমছে।

কেন কমছে উৎপাদন? এর আসল কারণ— বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা যতই অস্বীকার করুন— দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের চাহিদা তথা কেনার ক্ষমতার আকাল। যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির মধ্যে আমরা রয়েছি, তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবেই ক্রয়ক্ষমতার এ হেন অভাব। সমাজবিকাশের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্বে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শোষণমূলক এই ব্যবস্থাটিতে কীভাবে শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে পুঁজিপতি শ্রেণি সর্বোচ্চ মুনাফা লোটে। শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক ক্রমে নিঃস্বতর হতে থাকে। পাশাপাশি, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদন খরচ কমানোর বাধ্যতায় ক্রমশ উৎপাদন ব্যবস্থাকে যন্ত্রনির্ভর করে তোলে পুঁজিমালিকরা। কমতে থাকে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা, আর লম্বা হতে থাকে বেকার বাহিনী ও ছাঁটাই শ্রমিকের মিছিল। টান পড়তে থাকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের পকেটে। কমতে থাকে তাদের কেনার সামর্থ্য। একটা পর্যায়ে পৌঁছে যখন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কেনার ক্ষমতা হারায় তখনই অর্থনীতি চলে যায় মন্দার গ্রাসে। একের পর এক বন্ধ হতে থাকে কল-কারখানা-দোকান-বাজার। বেকারি আরও বাড়তে থাকে, আরও কমতে থাকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা।

এদেশের ছবিটা এখন ঠিক এইরকম। বর্তমানে ভারতে বেকারির হার এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছে। গত ৪৫ বছরের মধ্যে এমন ভয়াবহ বেকারত্ব দেশের মানুষ দেখেনি। মন্দার কারণে শুধু গাড়ি শিল্পেই প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের কাজ চলে যেতে বসেছে। করুণ অবস্থা পোশাক শিল্পের। উত্তর ভারতের কাপড়ের কারখানাগুলির সংগঠন 'নিটমা' আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, মন্দার প্রভাবে এই শিল্পে কাজ হারাতে পারেন ৫০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ যুক্ত আছেন চাষবাসের কাজে। তাঁদের অবস্থা ভয়াবহ। সার-বীজ-কীটনাশকের খরচে জেরবার ঋণগ্রস্ত চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। আত্মঘাতী চাষির মিছিল দিনে দিনে দীর্ঘতর হচ্ছে। অর্থনীতির বাকি ক্ষেত্রগুলিরও একই হাল। সব মিলিয়ে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ঠেকেছে তলানিতে। উৎপাদিত শিল্পপণ্যগুলি গুদামে জমে থাকছে, বিক্রি হচ্ছে না। ফলে ক্রমে বেড়ে চলেছে বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা-ব্যবসাবাণিজ্যের সংখ্যা।

এই যখন অবস্থা তখন দরকার ছিল সরকারের তরফে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে টাকার জোগান দেওয়া। দরকার ছিল সার-বীজ-কীটনাশকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সীমাহীন মুনাফা বন্ধ করে সেগুলি চাষিদের সস্তায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত মূল্যে চাষির ফসল কিনে নিয়ে গ্রামীণ মানুষের হাতে নগদ টাকার জোগান বাড়ানো। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে কেনার ক্ষমতা তুলে দিতে পারলে অর্থনৈতিক মন্দা কিছুটা হলেও কাটানো যেত। সরকারের উচিত ছিল সেই পথে হাঁটা। কিন্তু তা না করে দেখা যাচ্ছে পুঁজিপতিদের জন্য খয়রাতির দানছত্র খুলে দিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। বাজেটে বিপুল সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার পরেও গত ২০ সেপ্টেম্বর মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী কর্পোরেট সংস্থাগুলির করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের হাতে নতুন করে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই ঘোষণার ঠিক আগেই রপ্তানি ব্যবসায় সুবিধা দেওয়ার নামে পুঁজিপতিদের ৫০ হাজার কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। বড় মাপের রিয়েল এস্টেট কারবারিদের জন্যও ১০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছে তারা। বাস্তবে ২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুঁজিমালিকদের তুষ্ট করার কাজে ছেদ ঘটায়নি মোদি সরকার। গত সাড়ে পাঁচ বছরে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা পুঁজিপতিদের উপঢৌকন দিয়েছে তারা।

এর উপর রয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে শোধ না করার ঘটনা। শুধু বিজয় মাল্য, নীরব মোদি, মেহুল চোকসিদের মতো রাঘব-বোয়ালরাই নয়, আরও বহু বিত্তশালী শিল্পপতি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করেন না। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ থেকে '১৮ সাল পর্যন্ত শোধ না হওয়া ঋণ বা এনপিএ-র মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা। এইসব ঋণখেলাপিদের মধ্যে একটা বড় অংশই হল বৃহৎ পুঁজিপতি। এদের গ্রেপ্তার করে, সম্পত্তি ক্রোক করে ঋণের টাকা আদায় করার বদলে মোদি সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচাতে এ বছরে জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ৭০ হাজার কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। যদিও ব্যাঙ্ক থেকে নতুন ঋণ নেওয়ার লোকেরই অভাব। বিনিয়োগ হলে তবে তো ঋণের প্রশ্ন আসে। চাহিদার অভাবে সে পথ বন্ধ। স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানই বলছেন, ২ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে বসে আছেন তাঁরা, ঋণ নেওয়ার লোক নেই।

উৎপাদনের জন্য লগ্নিতে উৎসাহ দেওয়ার নামে পুঁজিপতিদের পায়ে দেদার টাকা উপঢৌকন দিয়ে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। অথচ পুঁজিমালিকদের মুনাফা যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তা থেকেই স্পষ্ট লগ্নি বা পুঁজির অভাবের জন্য নয়, দেশের অর্থনীতি মন্দায় ধুঁকছে দেশের মোট ক্রেতাদের অধিকাংশ, অর্থাৎ খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা না থাকার কারণে। পুঁজিপতিদের পাইয়ে দিতে সরকার যত দরাজ হচ্ছে, ততই দুর্দশা বাড়ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। কারণ মালিকদের পায়ে যত টাকা ঢালা হচ্ছে, ততই কমছে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ। তাই পুঁজিমালিকদের তুষ্ট করার দাপটে রাজকোষে যখনই টান পড়ছে, তখনই কমতে থাকছে ভরতুকি সহ কল্যাণমূলক খাতগুলিতে সরকারি খরচ। কমছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যে বরাদ্দের পরিমাণ। উঠে যেতে বসেছে রেশনের মতো কম দামে মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটিও।

গরিবি বেকারি ছাঁটাইয়ে জর্জরিত কোটি কোটি মানুষ দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছে দারিদ্রের অন্ধকারে। অসহনীয় জীবনযন্ত্রণায় জেরবার হয়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। প্রধানমন্ত্রী কিংবা সরকারে তাঁর প্রধান সহযোগী অমিত শাহদের হেলদোল নেই। তাঁরা ব্যস্ত পুঁজিমালিকদের মুনাফার ভাণ্ডার রক্ষার 'মহান' কাজে।

পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় এটাই নিয়ম। এখানে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজারের কাজ করে সরকারে আসীন দলগুলি। সেই পথ ধরেই পুঁজিপতিদের পায়ে দাসখত লিখে দিয়ে কেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতায় বসেছে বিজেপি। সেই দাসখত মেনেই জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ পুঁজিপতিদের হাতে অবাধে তুলে দেন মোদি-শাহরা। তাই আম্বানি, আদানিদের সম্পদের পরিমাণ যখন আকাশ ছোঁয়, ঠিক তখনই দেশের খাদ্যভাণ্ডারে ৭১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও কেনার ক্ষমতা না থাকায় সরকারি হিসাবেই ২০ কোটিরও বেশি মানুষকে না খেয়ে মরতে হয়।

যতদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে, অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চলবে, ততদিন এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। অথচ, দেশবাসীর প্রয়োজনকে সামনে রেখে যদি উৎপাদন হত, তবে সেই প্রয়োজন মেটাতে অজস্র কল-কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন হত এবং সেই পথেই বেকার সমস্যারও সমাধান হত। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অটুট রেখে তা হওয়ার উপায় নেই। তাই পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, ততদিন এই সংকট থাকবে এবং ক্রমাগত তীব্র হবে। এর মধ্যেও বেসরকারিকরণ রুখে দিয়ে জনগণের স্বার্থে সামাজিক কল্যাণে সরকারকে খরচ করতে বাধ্য করা, কৃষকদের আয়ের গ্যারান্টি ইত্যাদি দাবি আদায় করার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন চাই। একই সাথে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিচালিত পরিকল্পিত অর্থনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে।

রেলে বেসরকারিকরণ

একের পাতার পর

তারা একধাপ এগিয়ে। কর্পোরেট পুঁজিপতির দল এই জমিগুলো জলের দরে কিনে শপিংমল, আবাসন প্রভৃতি তৈরি করবে। রেলমন্ত্রী এ-ও বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বেসরকারি মালিকদের হাত ধরে।

সরকার রেলের ভাড়া বাড়ানো এবং বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে বরাবর প্রচার করে থাকে, 'রেলে প্রতি বছর কয়েক হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়'। এই অজুহাতে 'প্রিমিয়াম তৎকাল', 'সুবিধা' ইত্যাদির নামে মানুষের নিরুপায় অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি টাকা রোজগার করে রেল। এ ছাড়া রেল পরিবহণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাশুল অনেক বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ স্লিপারের ভাড়াও নানা অজুহাতে বাড়িয়ে চলেছে রেল দপ্তর। অন্য দিকে বর্ষীয়ান নাগরিক এবং সাধারণ যাত্রীদের কাছে টিকিটের ফর্মে এবং ইন্টারনেটে আবেদন করা হচ্ছে ভর্তুকি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অথচ এবারের রেল বাজেটে সরকার দেখিয়েছে, গত আর্থিক বছরে রেলের মোট আয় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা এবং খরচ ১ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। নেট লাভ ৬ হাজার ১৪ কোটি টাকা। বাজেটের হিসাবে প্রতি ১০০ টাকা আয়ে রেলের খরচ ৯৬.২ টাকা। তা হলে রেলের মতো একটি লাভজনক সরকারি প্রতিষ্ঠান যেখানে ১৪ লক্ষ কর্মচারীর এবং তাদের পরিবারের ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ যুক্ত, তা বেসরকারিকরণ কেন করা হচ্ছে?

কর্পোরেট মালিকরা তো অধিক মুনাফা লাভের দিকে তাকিয়ে রেল পরিচালনা করবে। তেজস ট্রেন চলছে। বিলাসবহুল পরিষেবার নামে যা ভাড়া তাতে এই ট্রেনে সাধারণ মানুষের পক্ষে যাতায়াত করা অসম্ভব। আবার এগুলোতে না থাকবে বর্ষীয়ান নাগরিক, শিশু ও অসুস্থদের জন্য ছাড়। এর ফলে এক দিকে দ্বিগুণ, তিনগুণ ভাড়া বৃদ্ধি হবে, অন্য দিকে হবে অবাধে কর্মীসংকোচন। রেলে এখন ৩ লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে। এগুলো পূরণ তো দূরের কথা, রেলমন্ত্রক ঘোষণা করেছে, ৫৫ বছরের অধিক বয়স এবং যারা ৩০ বছর কাজ করেছেন তাদের অবসর নিতে হবে। এই ভাবে তারা আরও সাড়ে ৩ লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাই করতে চলেছে।

রেলমন্ত্রক যতই উন্নত যাত্রী পরিষেবা ও নিরাপদ যাত্রার কথা বলুক, বাস্তব হচ্ছে এ স্তোকবাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। যাত্রীরা জেনে গেছেন ট্রেনে তাদের চোর, ডাকাত, ছিনতাইবাজের কবলে যে কোনও সময় পড়তে হতে পারে এবং যে কোনও দিন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে জীবনহানিও ঘটতে পারে। বেসরকারি সংস্থা যারা অধিক মুনাফার স্বার্থে কর্মী সংকোচন সহ জনস্বার্থ বিরোধী নীতি নিয়ে চলে তারা কি সাধারণ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারে?

রেলে বেসরকারিকরণের ফলে শুধু মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া বাড়বে তাই নয়, লোকাল ট্রেনগুলিও এ থেকে ছাড় পাবে না। এ দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ যারা প্রতিদিন নানা প্রয়োজনে শহরে যান, লোকাল ট্রেনে গাদাগাদি করে তুলনামূলক কম ভাড়ায় যাতায়াত করেন, সস্তায় সবজি বিক্রি করেন, তাদের অবস্থা হয়ে উঠবে অসহনীয়। মানুষের রোজগার তলানিতে চলে যাবে। বাজার সংকট আরও বাড়বে।

রেলের বেসরকারিকরণের নাগপাশ থেকে বেরোতে হলে বিজেপি সরকারের এই মানুষ-মারা নীতির বিরুদ্ধে চাই গণপ্রতিরোধ। শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াই ছাড়া একে প্রতিহত করা যাবে না।

ধনকুবেরদের স্বার্থেই ব্যাঙ্ক সংযুক্তি

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৩০ আগস্ট ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তি ঘটিয়ে সংখ্যাটা চারে নামিয়ে আনা হল। এর ফলে দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১৮ থেকে কমে দাঁড়াল ১২-তে। মন্দা কবলিত ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত '৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি' পূরণ করার লক্ষ্যে সরকার যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, এই সংযুক্তিকরণ তারই অঙ্গ। অনাদায়ী ঋণে (এনপিএ) দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাঙ্কগুলিতে সরকার নতুন করে আরও পুঁজি ঢালার কথা ভাবছে, যাতে ব্যাঙ্কপুঁজিকে আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যায়।

এবারই প্রথম নয়, বিজেপি ক্ষমতায় এসেই বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট, অনাদায়ী ঋণের ভারে জর্জরিত দুর্বল ব্যাঙ্কগুলি সংযুক্তিকরণের কর্মসূচি নিতে শুরু করে। ২০১৭-য় দেশে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ছিল। কিছুদিনের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে ৫টি সহযোগী ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক মিশিয়ে দেওয়া হল। একইভাবে ব্যাঙ্ক অব বরোদার সঙ্গে দেনা ব্যাঙ্ককে গত বছর জুড়ে দেওয়া হয়। এর পরই দেখা যায় আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নেয় এলআইসি।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে মিশিয়ে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সরকার নিয়ে চলেছে, এতে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। ব্যাঙ্ক সংযুক্তির কথা ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মী-অফিসার সকলেই। ব্যাঙ্ককর্মী ও অফিসারদের ইউনিয়নগুলি বিক্ষোভ-প্রতিবাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই সংযুক্তিকরণ আসলে অনাদায়ী ঋণ বা অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যাকে চাপা দেওয়ার কৌশল বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, "অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা বাড়ার দরুন অনেক ব্যাঙ্কই লোকসানে ডুবছে। দেউলিয়া আইনের আওতায় ঋণখেলাপি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে,তাদের অনেকে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে (এনবিএলসি) গিয়েওছে, যাতে ওই ঋণ আদায় করা যায়'। কিন্তু ট্রাইবুনাল যেসব নির্দেশ দিচ্ছে, তাতে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের একটা বড় অংশ ছেড়ে দিতে হচ্ছে (হেয়ারকাট)।

যখন গোটা দেশে শিল্প ধুঁকছে, নতুন লগ্নি হচ্ছে না, বিদেশি লগ্নি তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে, কৃষির অবস্থা শোচনীয়, ফসলের দাম নেই, ঋণের দায়ে লক্ষ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করছে, নোট বাতিল ও জিএসটির ধাক্কায় ছোট-বড়-মাঝারি কারখানার নাভিশ্বাস উঠছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, বেকারির হার সর্বোচ্চ, কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি এক শতাংশের কম, কৃষিতে তা ২ শতাংশের কম— এইরকম একটা শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে নেমে আসার কথা ঘোষণার ঠিক পূর্বমুহূর্তেই দশটি ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে— তবে কি মোদি সরকারের অর্থনীতি অর্থাৎ মোদিনমিক্সের গভীর সংকট ও অতি করুণ অবস্থা থেকে দেশের মানুষের নজর ঘোরাতেই এই ঘোষণা!

এ ছাড়াও, মোদি সরকার যে ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘাড় ধরে ১,৭৬,০৫১ কোটি টাকা আদায় করেছে, তা নিয়েও গভীর আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ সব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় কি হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে অথবা ভবিষ্যৎ ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজন কি আগের মতো নেই বা তা কমে গিয়েছে? বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বা বড় আকারে 'নেগেটিভ ট্রেড ব্যালান্স' বা বিদেশি মুদ্রা ও গোল্ড রিজার্ভ-এ ঘাটতি দেখা দিলে তাকে সামাল দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সামর্থ্য সাধারণত থাকার কথা, এর মধ্য দিয়ে তাকেই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপৎকালীন তহবিল থেকে জোর করে নজিরবিহীনভাবে টাকা আদায়ের এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের মোদি সরকারের ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সঙ্গে যুক্ত— এ সম্ভাবনাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্ক সংযুক্তির প্রশ্নে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, ব্যাঙ্কে যাঁদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ব্যাঙ্কের কাজকর্মে তাঁদের কোনও অসুবিধা হবে না। কোনও কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে না। কিন্তু যে কথাটা তিনি গোপন রেখেছেন, তা হল, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফিনান্স (পিএসসিএফ) ২০১৮ সালে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে স্পষ্ট গতবারের সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে এসেছিল। ইতিমধ্যে সারা দেশে ব্যাঙ্কের মোট শাখার সংখ্যা ২৪ হাজার থেকে ২২ হাজারে নেমে এসেছে। শুধু এস বি আইতে ৩ হাজার ৫০০ কর্মী স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। এ বারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে হবেই, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের শাখা কমবে, হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই হবে— এ কথা হলফ করে বলা যায়। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কগুলিতে স্বল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে কাজ হাসিল করার জন্য কর্মীদের কাজের চাপে যে হিমশিম অবস্থা, এই সংযুক্তিকরণ সেই বোঝা আরও বাড়াবে।

তবে কর্পোরেট সেক্টরগুলি যথেষ্ট খুশি। এই সংযুক্তিকরণ ও তার পাশাপাশি ব্যাঙ্কশিল্পে যে সব সংস্কারের কথা অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়ে বণিকসভা অ্যাসোচেমের সভাপতি বি কে গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'এই পদক্ষেপে শিল্প তো বেশি ঋণ পাবেই। সেই সঙ্গে এই পথে হেঁটে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পরিচালনায় পেশাদারি মনোভাব আনার ব্যবস্থাও করেছেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী মহাশয়া সাংবাদিক বৈঠকে প্রথমেই দাবি করেছেন ২০১৭-'১৮ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে এনপিএ মোটামুটিভাবে ৮.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে ৭.৯০ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। কত সহজে মন্ত্রী মহাশয়া টাকার অঙ্ককে কম করে দেখিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করলেন! ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দেওয়ার বিষয়টি তিনি চেপে গেলেন। ২০১৪-'১৮ এই চার বছরে ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতা খুললে দেখা যাবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সঞ্চিত জনগণের হকের টাকা থেকে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে। এই ঋণ মকুবের টাকা লুটেপুটে খেল কারা? নিঃসন্দেহে ধনকুবের গোষ্ঠী, কর্পোরেট সংস্থাগুলি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্ট (২০১৮-'১৯) বলছে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে প্রতরণা-জালিয়াতির ঘটনা বেড়ে চলেছে। ফলে ২০১৭-'১৮ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে অনাদায়ী ঋণ ৪১ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা থেকে এক ধাক্কায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ৫৪৩ কোটিতে। শুধু তাই নয়, প্রতারণা-জালিয়াতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। ৩,৭৬৬ টি ঘটনায় প্রায় ৬৪,৫০৯ কোটি টাকা জালিয়াতি হয়েছে। তার আগের বছর ২,৮৫৫ টি ঘটনায় অর্থ নয়-ছয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮ হাজার ২৬০ কোটি টাকা। এই প্রতারণা-জালিয়াতিতে যুক্ত বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসির মতো অসৎ ব্যবসায়ীরা কেন্দ্রের মোদি সরকারের মদতে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

অনুৎপাদক সম্পদ নয়ছয়ের বাড়-বাড়ন্তে জেরবার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর তা থেকে বেরিয়ে আসতে এই সংযুক্তিকরণ। এর ফল দাঁড়াচ্ছে মারাত্মক। ফুটো কলসিতে জল ঢালার মতো এ প্রয়াস।

আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, সংযুক্তিকরণের পরেও আশঙ্কা পিছু ছাড়ছে না মানুষের। বিশেষ করে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে আমানতকারীদের মধ্যে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের কষ্টার্জিত আয়ের থেকে কিছু বাঁচিয়ে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। বিপদে-আপদে-প্রয়োজনে ভরসা এই সঞ্চয়। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের অবসরকালীন শেষ ভরসা এই সঞ্চয়টুকু। সেখানেও শেষপর্যন্ত নেমে আসতে পারে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকা বা সঞ্চয় ব্যাঙ্কে কতটা নিরাপদ, এই নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। যাই ঘটুক, রুগ্ন হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত দায় থাকে সরকারের। এখনও পর্যন্ত এটাই চালু আছে। এই ভরসায় মানুষ ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। সারা বিশ্বে এর পোশাকি নাম 'বেল আউট'।

কিছু সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সংসদে এই শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরককার আনতে চলেছে ফিনান্সিয়াল রেজোলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিওরেন্স (এফআরডিআই) বিল। সেই বিলে ৫২ নম্বর ধারায় থাকছে অভূতপূর্ব বিধান। তার নাম বেল-ইন। বেল-ইন-এ বলা হচ্ছে বাইরের টাকায় ব্যাঙ্কের পুনর্জীবন আর নয়। অর্থাৎ সরকারি মদত বন্ধ। নিজের টাকাতেই বা কোমরের জোরে ব্যাঙ্ককে উঠে দাঁড়াতে হবে। ব্যাঙ্ক দুর্বল হলে ক্ষতিপূরণের জন্য আমানতকারীর টাকাই ব্যয়িত হবে। এমনকী আমাতকারীদের গচ্ছিত টাকা অস্বীকারও করতে পারে ব্যাঙ্ক। সেভিংস, কারেন্ট, ফিক্সড ডিপোজিটে আমানতের কিছু অংশ আমানতকারীদের ফেরৎ দিয়ে বাকিটা যাবে শেয়ার বাজারে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের হকের টাকা তাঁদের হাতে থাকবে না, চলে যাবে শেয়ার বাজারের ফাটকা কারবারে।

কোনও কারণে রুগ্ন হয়ে পড়া ব্যাঙ্কের দায়ও নেবে না সরকার। এই কালা 'এফআরডিআই' বিল আইনে পরিণত হলে গঠন করা হবে 'ফিনান্সিয়াল রেজোলিউশন করপোরেশন'। তার আওতায় থাকবে সরকারি-বেসরকারি-গ্রামীণ, সমবায়, নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা, সরকারের সব রকমের জীবনবিমা, সাধারণ বিমা সংস্থাগুলি।

প্রশ্ন উঠছে, শিল্পপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণে রুগ্ন ব্যাঙ্কের বোঝা মানুষ বইবে কেন? অনাদায়ী ঋণের পাহাড় কি ব্যাঙ্কের ব্যর্থতা নয়? ব্যাঙ্ক লাভ করলে আমানতকারীদের ভাঁড়ার শূন্য। ব্যাঙ্কের ক্ষতির বোঝা তবে সাধারণ সঞ্চয়ীদের কেন বহন করতে হবে? মানুষকে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে সরকারের কি দায় নেই? আমানতকারীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই বিলের লক্ষ্য কেন 'বেল-ইন' হবে? যদিও ব্যাঙ্কগুলির পুনর্জীবনের উদ্দেশ্যে এই বিল আনছে বলে দাবি কেন্দ্রের। আমানতকারীর টাকা সুরক্ষিত থাকবে বলে আশ্বাস সরকারের। কিন্তু সরকার যাই বলুক না কেন, মানুষ তাঁর সহজ বুদ্ধিতে বিলটির মর্মবস্তু বুঝে ফেলেছেন। এই বিলে নিহিত 'বেল-ইন' এক সর্বনাশের বিধান হয়ে আসছে বলে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরাও দৃঢ়ভাবে মনে করছেন।

স্বাধীনতারপর 'দেশ গড়ার' স্লোগান তুলে জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত বড় ও মাঝারি সংস্থা ও শিল্প-কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। আজ সেসব জলের দরে কর্পোরেটদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার পোশাকি নাম বিলগ্নিকরণ। এর শুরু হয়েছিল কংগ্রেস আমলেই। বাজার অর্থনীতির গতি আনতেই নাকি এসব খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। এখন বাকি রয়েছে পিএসবি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে এই পথে সামিল করা।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে চাই 'বড় পুঁজির বড় ব্যাঙ্ক'। অথচ আজ গোটা অর্থনৈতিক দুনিয়ায় 'বড় ব্যাঙ্কের মডেল' প্রায় পরিত্যক্ত। কারণ ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বলছে, দুর্বল ব্যাঙ্কের দায়ের বোঝা বইতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সবল ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক সংযুক্তির এই সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে না। এতে লাভবান হবে ধনকুবের গোষ্ঠীগুলি। অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণরে লক্ষ্যে আজ সরকারের এই সিদ্ধান্ত।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

বিজেপি রাজত্বে উন্নয়ন!

গুজরাত মডেল

নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে পিয়ন পদে চাকরি পেলেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা। গুজরাত হাইকোর্টে পিয়ন ও দেওয়ান পদে চাকরির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়। ১১৪৯ টি শূন্যপদের জন্য ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৭৮ জন আবেদন জানিয়েছিলেন। যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওই পদে যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৭ জন চিকিৎসক, ৪৫০ জন ইঞ্জিনিয়ার ও ৫৪৩ জন স্নাতকোত্তর আছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা- ১০।১০।২০১৯

আইআইটি-তে ফি বাড়ল ৯০০ শতাংশ

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি গুলিতে এম টেক-এ পড়ার ফি ৯০০ শতাংশ বাড়াল আইআইটি কাউন্সিল। এমনকি এম টেক-এর যে স্কলাররা 'গেট' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাসিক ১২, ৪০০ টাকা বৃত্তি পেতেন, তাও বন্ধ করে দেওয়া হল।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া-২২।৯।২০১৯

চুপিসারে গ্যাসের ভর্তুকিতে কোপ

অক্টোবরেও রান্নার গ্যাসে ভর্তুকির সুবিধা কমানোর অভিযোগ উঠল। সূত্রের খবর, কলকাতায় ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের ভরতুকির পরিমাণ আগস্টে ছিল ৭৪.০৫ টাকা, সেপ্টেম্বরে ছিল ৮১.৯৫ টাকা, অক্টোবরে হয়েছে ৮৭.৯৫ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা-১০।১০।২০১৯

বরানগরে বাঘা যতীনের মূর্তি ভাঙায় বিক্ষোভ, থানায় ডেপুটেশন

রাতের অন্ধকারে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের আবক্ষ মূর্তি ভাঙা হল বরানগরে। প্রতিবাদে ১৩ অক্টোবর এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং বরানগর আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলের শুরুতে ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তির সামনে বাঘা যতীনের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ডিওয়াইও-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রমেশ দাস এবং ডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড মেঘবরণ হাইতি। ওই সময় উপস্থিত সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এরপর মিছিল করে বরানগর থানায় ডেপুটেশন দেয় চার জনের প্রতিনিধি দল। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং বাঘাযতীনের মূর্তি পুনঃস্থাপনের দাবি জানান তাঁরা।

মোটরভ্যান চালকদের মালদা জেলা সম্মেলন

মোটরভ্যান চালকদের সরকারি লাইসেন্স, পরিবহণ কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, পুলিশি নির্যাতন বন্ধ, দুর্ঘটনা বিমা চালু করা সহ সাত দফা দাবিতে ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের আহ্বানে সপ্তম মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে। দেড় সহস্রাধিক ভ্যান চালক প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষক মহেশ্বর ভট্টাচার্য এবং এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা নেতা কমরেড গৌতম সরকার। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত সাহা, জেলা সম্পাদক কার্তিক বর্মন। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি অংশুধর মণ্ডল। সম্মেলনে এনআরসি এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম আইন সংশোধনের প্রতিবাদে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অংশুধর মণ্ডলকে সভাপতি ও কার্তিক বর্মনকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫৪জনের কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে শেষে মোটরভ্যান চালকদের বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিকদের সম্মেলন

২৩ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো অর্ডিনেশন কমিটির দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপুর ইস্পাতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রতিনিধিরা। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী। সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কমরেডস পরেশ বাউড়ি, রূপেন মুর্মু সহ অনেকে। এরপর বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি কমরেড অমর চৌধুরী। মূল বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ। সভাপতি ছিলেন কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী।

সম্মেলনে কমরেড বিশ্বনাথ মণ্ডলকে সম্পাদক এবং কমরেড সব্যসাচী গোস্বামীকে সভাপতি নির্বাচিত করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের বিক্ষোভ

স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে ডেইলি রেটেড কর্মীদের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। সিপিএম সরকারের মতোই বর্তমান তৃণমূল সরকার এঁদেরকে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করাচ্ছে। সম্প্রতি দাঁতন হাসপাতালে ৫ জন, খড়্গপুর হাসপাতালে ১২ জন এবং কেশিয়াড়ি হাসপাতালে ২ জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অবিলম্বে তাঁদের পুনর্বহালের দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে শতাধিক কর্মী বিক্ষোভ দেখায়। স্থায়ীকরণ, ন্যায্যমজুরি, পরিচয়পত্র প্রদান, বোনাস প্রদান এবং এজেন্সি প্রথা বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হন শ্রমিকরা। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য নেতা শুভাশিস দাস।

কার্নিভালের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই

কার্নিভাল নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, উৎসব আনন্দ খুবই ভাল, সবাই তা উপভোগ করছেন। কিন্তু তার জন্য সরকারের তরফ থেকে এত টাকা খরচ করে কার্নিভাল করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে যখন সরকার নিজেই প্রবল আর্থিক সংকটের কথা ঘটা করে বলে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে এটাও সত্য যে, এই কার্নিভালের সঙ্গে সাধারণ গরিব মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা সরকারকে এই বিষয়টা ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

জলপাইগুড়িতে পৌরসভা অভিযান

জলপাইগুড়ি শহরে সদর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন করলা সেতুর নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন, শহরে যানজট সমস্যার অবিলম্বে সমাধান, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি, শহরে বার ও রেস্তোরাঁগুলিতে দেহব্যবসার রমরমা রোধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ সহ কয়েক দফা দাবিতে ১৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) জলপাইগুড়ি শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে পৌরসভা অভিযান ও বিক্ষোভ অবস্থান সংগঠিত হয়। পৌরপিতা দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের আন্দোলন

নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের সরকারিভাবে নাম নথিভুক্ত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত করার দাবিতে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (পি এম পি এ আই)-এর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। বহু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে যায়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ নীলরতন নাইয়া, ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি যুগল পাখিরা সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ। স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্য সচিবের কাছে এবং নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেয়।

ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপারদের বিক্ষোভ

রাজ্য সরকারি দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপাররা বঞ্চিত ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা থেকে। প্রশাসনিক অনুমতি দেরিতে পাওয়া এবং ক্রমাগত বৃষ্টি সত্ত্বেও তাঁরা এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার (কর্মবন্ধু) কর্মচারী সমন্বয় সমিতির আহ্বানে ১১ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জেলা থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ-এ বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন সমরেন্দ্রনাথ মাঝি ও দিলীপ চক্রবর্তী। ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন, ডি-গ্রুপের কর্মী হিসাবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি দাবিতে নিখিল বেরা, প্রভাত পণ্ডিত, দিলীপ বিশ্বাস সহ বহু কর্মচারী বক্তব্য রাখেন। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রবীর দে, ছাড়াও অমিত মান্না সভায় বক্তব্য রাখেন। সমিতির সম্পাদক রাধারমণ দত্ত উপস্থিত কর্মচারীদের জেলায় জেলায় আরও সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। দু'টি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীকে এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিককে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

বাঁকুড়া জেলা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

২ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নবম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি অমিয় গোস্বামী। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শবীন্দ্রনাথ কুমার। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন অধ্যাপক কৃষ্ণদাস গোস্বামী। প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী। অমিয় গোস্বামীকে সভাপতি, স্বপন নাগকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বন্যাপীড়িতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ ও মেডিকেল ক্যাম্প

'বিহারের বন্যাপীড়িতদের সরকারি সাহায্য দিতে হবে' এই দাবিতে ৫ অক্টোবর পাটনা জেলা কমিটির বিক্ষোভ

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে ১৩ অক্টোবর এআই ডিএসও, এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে বন্যাপীড়িতদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির করা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই শিবির পরিচালনা করেন।

১১ অক্টোবর ত্রিপুরার আগরতলায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বন্যা দুর্গতদের জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র ত্রাণ সংগ্রহ

বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেতু নির্মাণের দাবি কোচবিহারে

৭ সেপ্টেম্বর কোচবিহার ১নং ব্লকে কাটামারী বাবুরহাট মোড়ে শালটিয়া নদী ও সামগ্রিক উন্নয়ন কমিটির ডাকে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি মজিরুদ্দিন মিঞা বলেন, শালটিয়াতে বহুকোটি টাকা খরচ করে যে সেতু নির্মাণ চলছে এতে নদী সঙ্কুচিত হওয়ায় ভাটিতে গত বন্যায় বহু পরিবার ঘরবাড়ি, তিন ফসলি জমি হারিয়েছে, এমনকি কাটামারী থেকে চান্দামারী যাওয়ার বিশেষ সড়ক অর্ধেকটা ভেঙে গিয়েছে। সরকারি গোচরে আনা সত্ত্বেও নদী ভাঙন রোধ, ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়নি। আলু-ধান-পাট চাষি সংগ্রাম কমিটির সভাপতি উপেন বর্মনের দাবি, শালটিয়াবাসীর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের হিসাব কোচবিহারবাসীকে দিতে হবে। কমিটির সম্পাদক নৃপেন কার্যী বলেন, ১৯৮০ সালের দিকে তৎকালীন রাজ্য সরকারের আমলে চান্দামারী গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশে মজিদ ভাঙা কাঠের পুল থেকে খাল কেটে কুমির আনা হয়েছে। এর ফলে এলাজান শোলটিয়া ভ্যারভ্যারী, নলডোবা, ঝলঝলি ইত্যাদি বিলগুলি ও নিচু জলাভূমির মধ্য দিয়ে শালটিয়া নদীর উৎপত্তি হয়, সরকারি প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় কয়েক হাজার বিঘা জমি, বাগান, বাড়িঘর, রাস্তা ধ্বংস হয়। কমিটি এ বিষয়ে বহুবার ডেপুটেশন, অবস্থান, আইন-অমান্য করেছে এমনকি সারা বাংলা নদী কমিটির আহ্বানে কলকাতায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, দিল্লিতে নদী কমিশন মন্ত্রালয়ে জয়নগরের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, রাজ্যসভার সাংসদ দেবেন বর্মনের সহযোগিতায় স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের চাপে বর্তমানে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হলেও তা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হচ্ছে না। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মিঞা, রমজান আলি মিঞা, রতন বর্মন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জেসিবি গঠনের দাবি জানাল এআইকেকেএমএস

২৬ সেপ্টেম্বর এআইকেকেএমএস-এর এক প্রতিনিধিদল পাট চাষিদের রক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে দেখা করেন এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মহারাষ্ট্রে তুলা এবং উত্তরপ্রদেশে আখ এবং পশ্চিমবঙ্গে পাট হল অর্থকরী ফসল। বিশ্বের মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। পরিবেশবান্ধব হিসাবে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদাও ব্যাপক। নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থা জেসিআই পাটশিল্প-পাটচাষ-পাটচাষিদের বাঁচাবার জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না। তারা যতটুকু পাট কেনে তার বেশিরভাগটাই ফড়েদের কাছ থেকে। চাষিরা জেসিআই-এর কাছে পাট খুব একটা বিক্রি করতে পারে না। তা ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে লাভজনক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাজারে যতটুকু দাম থাকে তা ফড়ে সিন্ডিকেট রাজ্যের দৌরাত্ম্যে চাষিরা পায় না। ফলে রাজ্য সরকারের উচিত জুট কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল গঠন করে সরকারি চাষিদের কাছ থেকে পাট কেনা। তা হলে ফড়েরাজের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে এবং চাষিরা লাভজনক দাম পাবে। নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, কমপক্ষে ৭০০০ টাকা কুইন্টাল দাম ধার্য করা উচিত। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সংগঠনের বক্তব্য ন্যায্য মনে করলেও রাজ্য সরকারের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব নয় বলে জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ঘটনা দেখাল রাজ্যের তৃণমূল সরকার কৃষক সমস্যা সম্পর্কে কত উদাসীন।

আইসিডিএস কর্মী-সহায়িকাদের বাসন্তী ব্লক সম্মেলন

আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম বেতন মাসিক ১৮, ০০০ টাকা, জ্বালানি ও সবজি-কলা সহ অন্যান্য জিনিসের দাম বাজারমূল্যে দেওয়া, অন্য কাজে কর্মীদের নিয়োগ করে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত না করা, কাজের সুবিধার্থে অ্যান্ড্রয়েড ফোন সরবরাহ করা ইত্যাদি দাবিতে বাসন্তী বাজার সংলগ্ন একটি হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের বাসন্তী ব্লক শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত। সম্মেলনে সেরিনা মিদ্দেকে সম্পাদিকা ও সুচিত্রা হালদারকে সভানেত্রী নির্বাচিত করে ২৬ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের পর সিডিপিও-র কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

যুবশ্রীদের গণকনভেনশন ও নবান্ন অভিযান

রাজ্যে তৃণমূল সরকার ২০১২ সালে 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক' চালু করে এবং বর্তমানে এই ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ। এর মধ্যে এক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীকে যুবশ্রী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে মাসিক ১৫০০ টাকা ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন ২০১৫ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বেকারদের সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।

কিন্তু দীর্ঘ ছয় বছর কেটে গেলেও যুবশ্রীদের কোনও শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়নি। এই অবস্থায় রাজ্যের যুবশ্রীদের উদ্যোগে ২৪ সেপ্টেম্বর এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে। স্থায়ী চাকরি চাই, চাকরি না হওয়া পর্যন্ত বাজারমূল্য অনুযায়ী উৎসাহ ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বেকারদের চাকরি দিতে হবে— এই দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করতে পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি গঠিত হয়। বর্ষীয়ান আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী, সোমনাথ ব্যানার্জী এবং অধ্যাপিকা সুচেতা কুণ্ডু উপদেষ্টা, নির্মল মাঝি সভাপতি এবং নিতাই বসাক ও চন্দ্রকান্ত কুইল্যা যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর এই সমিতির নেতৃত্বে নবান্ন অভিযান হয়।

ঢাকুরিয়া স্টেশন ইনচার্জকে স্মারকলিপি

অবিলম্বে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতাবৃদ্ধি, ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টার খোলা ও ফুটব্রিজ সংস্কারের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে স্টেশন ইনচার্জের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্টেশন ইনচার্জ ফুট ব্রিজ সংস্কারের কাজ অবিলম্বে করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অন্য দাবিগুলি উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

বিপন্ন নারী-নিরাপত্তা

একের পাতার পর

এই বিষয় দু'টি পরস্পরের পরিপূরক। মদ্যপ ব্যক্তির স্বাভাবিক সুস্থ চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না। কোনও অপরাধের গুরুত্ব বা তার পরিণতি কী হতে পারে— সেটা বিচার করার অবস্থায় সে তখন থাকে না। ফলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে মদ্যপদের আসর যত জমজমাট হতে থাকে, মহিলাদের স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় ততই ঝুঁকি বাড়তে থাকে, টিউশন পড়ে কিংবা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। পুজোর জাঁকজমক ও আড়ম্বরে সরকার যারপরনাই মদত দিয়ে চলেছে। চাইছে মানুষ উৎসবের হই-হুল্লোড়ে মেতে থাকুক। শারদোৎসব উপলক্ষে যে অনাবিল আনন্দের পরিবেশ বাংলার বহুদিনের ঐতিহ্য— এই হুল্লোড় তার ক্ষতি করছে। উৎসবের ভিড়ে মদ্যপদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে কি? নাকি শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? যদি কোনও সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, তবে সে সরকার সমাজের রুচি-সংস্কৃতির পরিবেশকে কলুষিত করার জন্য দায়ী মদের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারে না— রাজস্ব বৃদ্ধির নীতি হিসাবেও নয়। বরং মদ নিষিদ্ধ করে সমাজে সুস্থ সামাজিক পরিবেশকে সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

বই নিয়ে বললেন

যথার্থ বামপন্থাকে আপনারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন

সাধারণ মানুষের জীবনে বছরভর অসংখ্য অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্টকে যেন কয়েকটা দিনের জন্য চাপা দিয়ে দেয় শারদোৎসবের জাঁকজমক। মানুষও সব কিছুকে সরিয়ে রেখে মেতে উঠতে চায় উৎসবে। সে উৎসবের কত আড়ম্বর, কত আলোর রোশনাই! জীবনের চাপ চাপ অন্ধকারকে পাশ কাটিয়ে জনস্রোত ভেসে যায় উৎসবের দুর্নিবার আকর্ষণে।

সমাজেরই আর একদল মানুষ, উৎসবের মধ্যেও যাঁরা ভুলতে পারেন না জন জীবনের কঠিন সংকটকে, তাঁরা এই উৎসবেরই মাঝে দাঁড়িয়ে স্রোতের মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিয়ে বলেন, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কেন আপনার জীবনের সংকট এমন স্থায়ী হয়ে আছে, কেন এত আলোর ঝলকানি আপনার জীবনের অন্ধকার দূর করতে পারে না, তার কারণটা বুঝুন, সমাধানটা খুঁজুন— হাতে ধরিয়ে দেন বই। বলেন, আপনার জীবন সংগ্রামে এটাই হাতিয়ার!

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের হাজার হাজার কর্মী প্রতি বছর শারদোৎসবের সময়ে বই নিয়ে উপস্থিত হন জনতার মাঝে। এ বারেও রাজ্য জুড়ে অজস্র বুক স্টলে কর্মীরা সামিল হয়েছিলেন। স্টল হয়েছিল ত্রিপুরা, আসাম, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশা, দিল্লির মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও। সুসজ্জিত স্টলে মণিমুক্তোর মতো সাজানো ছিল বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নেতাজি ভগৎ সিং সূর্য সেন প্রীতিলতা সহ নবজাগরণের মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের জীবন-সংগ্রামের তাৎপর্য সংবলিত বই, শোষিত নিপীড়িত মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রামের পথনির্দেশিকা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন মাও সে তুং শিবদাস ঘোষের চিন্তা সংবলিত বই। জীবনসংগ্রামে যে মানুষ অন্য সময়ে খুবই ব্যস্ত থাকেন, তিনিই এই সময়ে থাকেন উৎসবের মেজাজে। কর্মীদের অনুরোধে স্টলের সামনে দুমিনিট দাঁড়ান। বই পছন্দ করে কিনে নিয়ে যান। বলেন, গণআন্দোলনে আপনাদের দেখি, এবার পড়ে দেখি তার অনুপ্রেরণা আপনারা কোথা থেকে পান। একজন একগুচ্ছ বই পছন্দ করে দাম মেটানোর পর বললেন, আপনাদের বইয়ের দাম এত কম কেন? উপস্থিত কর্মীটি উত্তর দিলেন, আমারা তো লাভের জন্য বই বিক্রি করছি না, মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলে ওঠেন, বুঝেছি, সত্যিকারের কমিউনিস্ট দলের তো এমনটাই হওয়ার কথা।

শুধু দলের অসংখ্য ছাত্র-যুব কর্মীরাই নন, কর্মী-সমর্থকদের পরিবারের শিশু-কিশোররাও প্রবল উৎসাহে করে বই বিক্রি করে এই ক'দিন। সাধারণজনের বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে ওঠে, 'এত বই নিয়ে এরা দাঁড়িয়ে আছে, এদের হাত ব্যথা করে না? এদের ঘুরতে ইচ্ছা করে না?' কলকাতার এসপ্লানেডে যে শিশুটি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল অষ্টমীর সন্ধ্যায়, তাকে এর উত্তর দিতে হয়নি। পাশে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী এগিয়ে এসে বললেন, 'জানেন, পুজোর সময় প্রতি বছর এরা এভাবে বই বিক্রি করে। আমার ডিউটি অন্য জায়গায় পড়লে এদের খুব মিস করি। এদের দেখলে মনে আশা জাগে— সব এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আমার নিজের সন্তান এমন হয়নি। কিন্তু এদের মধ্যেই আমি নিজের ছেলেমেয়েদের খুঁজি। যদি তারা এমন হত!' শেষ দিন সকলের জন্য কেক-লজেন্স কিনে দিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আবার দেখা হবে। এবার তরুণ ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মার্কসবাদী বই কেনার একটা বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। তাঁরা স্টলে এসে বেছে বেছে মার্কসবাদের নানা বইয়ের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের এবং কমরেড প্রভাস ঘোষের সমাজ-বিপ্লব সংক্রান্ত বইগুলি নিয়েছেন। কর্মীদের নানা প্রশ্ন করে বহু জিনিস বুঝে নিতে চেয়েছেন। এমনই এক বাবা তাঁর কিশোরী মেয়েকে নিয়ে এসে মনীষীদের সম্পর্কে স্টলের প্রতিটি বই কিনে নিয়ে বললেন, যদি সত্যিই মানুষ হতে হয়, এঁদের জীবনকে জানতে হবে।

নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতির স্রোতে জীবন-যৌবন পার করে এসে তীব্র হতাশা যখন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, সে সময়ে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বহু মানুষ এস ইউ সি আই (সি)-র স্টলে এসে খুঁজে পেয়েছেন আশার আলো। এমনই একজন কলকাতার একটি স্টলে এসে বললেন, ছাত্রাবস্থায় ডিএসও-র অনেক বিরোধিতা করেছি। তখন যদি শুনতাম ওরা কী বলতে চায়, তবে আজ এমন আফশোস করতে হত না। বাঁকুড়ায় বাম মনোভাবাপন্ন একজন শিক্ষক বেশ কয়েকটি ঠোঙায় নানা ধরনের খাবার নিয়ে স্টলে পৌঁছে বললেন, এখানকার এক প্রসিদ্ধ দোকানের খাবার, খেয়ে নিন। তারপর সদ্য প্রকাশিত নীহার মুখার্জী নির্বাচিত রচনাবলি সহ প্রায় দুশো টাকার বেশি বই নিলেন। বললেন, একজন নেতৃস্থানীয় বাম কর্মকর্তা বলছেন, এখন ডানপন্থীদের রমরমা। ফলে আমাদের নরম পথ নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আপনাদের দেখে আমি অভিভূত। আপনারা যথার্থ বামপন্থী হিসাবে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও মিলিট্যান্ট আছেন। জনসাধারণকে সজাগ সচেতন, আন্দোলনমুখী করতে লেগে আছেন। আপনাদের মতাদর্শ প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও পৌঁছে দিন, আমার একান্ত অনুরোধ।

যে কোনও মূল্যে এনআরসি চালুর চক্রান্তকে প্রতিহত করুন, স্টলে এই ঘোষণা সংবলিত ফ্লেক্স দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন পথচলতি বহু মানুষ। আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসে খোঁজ করেছেন এনআরসি নিয়ে কী কী বই রয়েছে। সেগুলি সংগ্রহ করতে করতে তাঁদের উদ্বেগ এবং এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র ক্ষোভ এবং ঘৃণা উগরে দিয়েছেন। কর্মীরা ১৩ নভেম্বর এনআরসির প্রতিবাদে রাজভবন অভিযানে সামিল হওয়ার অনুরোধ জানালে সাগ্রহে সম্মতি জানিয়েছেন।

শারদীয় বুক স্টল

এক প্রবাসী ভারতীয় হাওড়ার স্টলে এসে বলেছেন, 'আমি শিবদাস ঘোষের কিছু বই পড়েছি। মার্কসবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধির প্রকাশ তাঁর লেখায় পেয়েছি।' বন্ধুদের দেকে বলে বেশ কিছু বইয়ের অনেকগুলি কপি কিনে নিয়ে গেলেন। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্টেশনে স্টলে এসে এক মহিলা ৩০ টাকা চাঁদা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে মন চায়। কিন্তু এর বেশি আজ আর দিতে পারব না।' আরও বেশি দিতে না পারার বেদনায় চিকচিক করে ওঠে তাঁর চোখের কোণ। এ-সময় অন্যান্য রাজ্যের বহু মানুষ কলকাতায় আসেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি রাজ্যের বেশ কয়েকজন ছাত্র-যুবক বড় বাজার স্টল থেকে নানা হিন্দি-উর্দু বই নিয়েছেন। হায়দরাবাদের সরকারি স্কুলের এক তরুণ শিক্ষক বললেন, আমার যে কোনও সাহায্য লাগলে বলবেন। হাটে বাজারে গঞ্জে স্টেশনে সব জায়গাতেই স্টলের আশেপাশের দোকানদার, হকাররা বারবার এসে খোঁজ নিয়েছেন, খাওয়া হয়েছে কি না, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না।

এমন সব অসংখ্য উজ্জ্বল খণ্ডচিত্রের সমাহার এবারের এস ইউ সি আই (সি)-র বুকস্টলগুলি। দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণার উপশমের পথ খুঁজে পেতে বুকভরা ভালবাসা আর গভীর প্রত্যাশা ও ভরসা নিয়ে সাগর থেকে পাহাড় সর্বত্র এগিয়ে এসেছেন অগণিত মানুষ।

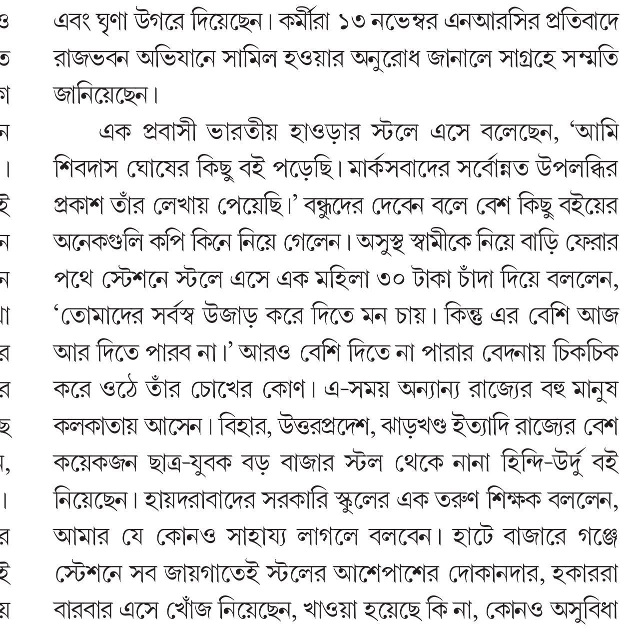

হাওড়ায় এস ইউ সি আই (সি)-র বুক স্টল

অযোধ্যার সত্য-মিথ্যা

কথিত আছে, রামের জন্ম অযোধ্যাতেই। ওখানেই কেটেছে তাঁর বাল্যকাল। তারপর বড় হয়েছেন, পাঠানো হয়েছে বনবাসে। ফিরে এসে ওখানেই রাজত্ব করলেন। রামের জীবনকথার এমন সব মুহূর্তগুলি স্মরণে স্থাপিত হয়েছে এক একটি মন্দির। খেলার জায়গায় গুলেলা মন্দির, লেখাপড়ার স্থানে বশিষ্ঠ মন্দির, যেখানে বসে রাজত্ব করলেন সেখানেও আছে একটি মন্দির। খাবারের জায়গাতে হল 'সীতা রসুই'। ভরতের বসার জায়গায় মন্দির, হনুমান মন্দির, কোপ ভবন, সুমিত্রা মন্দির, দশরথ ভবন— এমন বিশটি মন্দির সেখানে আছে, যাদের বয়স ৪০০ থেকে ৫০০ বছর।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তখন ভারতে যে মুঘল সাম্রাজ্যের কাল! মুসলমান শাসকরা সাহায্য করেছিলেন মন্দির গড়তে? প্রচার তো শুনি, মন্দির ভাঙার জন্যই তাঁরা কুখ্যাত! তাদের শাসনকালে একটা গোটা শহর মন্দিরময় হয়ে গেল, আর তারা কিছু বলল না! এ কেমন শত্রুতা যে তারাই মন্দিরের জন্য জমি দিয়ে দিল! গুলেলা মন্দিরের জন্য মুসলিম শাসকদের দেওয়া জমির কথা যারা বলে তারা নির্ঘাৎ মিথ্যাবাদী! কিন্তু দীগম্বর আখড়ার ওই দলিলটা! যেখানে লেখা আছে মন্দিরের জন্য মুসলিম শাসকরা ৫০০ বিঘা জমি দিয়েছে, সেটা একেবারে ডাহা মিথ্যা! আর নির্মোহী আখড়ার জমি যে সিরাজদ্দৌলার দান— এই দলিলটাও মিথ্যা না হয়ে পারে না নিশ্চয়ই! তাহলে সত্যি বলে রইল শুধু বাবর আর তার তৈরি মসজিদ! এখন তো তুলসীদাসকেও মিথ্যা মনে হচ্ছে! তিনি তো ১৫২৮ সালের কাছাকাছি জন্মেছিলেন। বাবর ওই সময়েই রাম মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ গড়েছেন বলে প্রচার আছে। তুলসীদাস তাহলে ওই ঘটনা হয় দেখেছিলেন, না হলে শুনেছিলেন! তিনি বসে বসে তখন দোঁহা লিখছেন—'তুলসী সরনাম গুলামু হৈ রামকো, যা কো রুচে সো কহৈ অউ। মাঙ্গি কি খৈবি, মসিতকো শৈবি, লৈবোকো একু ন দৈবেকো' 'তুলসী তো রামের প্রসিদ্ধ গোলাম। যার যা খুশি বলতে পারো, আমি ভিক্ষা করে খাব আর মসজিদে শোব। কারও সাথে আমার লেনা দেনা নেই।' তারপর লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রামায়ণ! রাম মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ গড়ছেন বাবর, আর তুলসীদাসের এতটুকু আফশোস হল না! এসব কথা কোথাও লিখেও গেলেন না! কিন্তু কেন?

অযোধ্যায় কি সত্য-মিথ্যা সব গুলিয়ে গেছে? পাঁচ পুরুষ ধরে মুসলিমরা সেখানে ফুলের চাষ করছেন। সেই ফুলই সব মন্দির আর সেখানে অধিষ্ঠিত দেবতাদের এমনকি রামের গলাতেও শোভা পায়! ওখানকার মুসলিমরা কাঠের খড়ম তৈরির পেশায় কে জানে কবে থেকে আছে! ঋষি-মুনি, সন্ন্যাসী, রামভক্ত, সবাই সেই খড়ম পরে মন্দিরে ঢোকেন। চার দশক ধরে সুন্দর ভবন মন্দিরের পুরো দায়িত্ব রইল এক মুসলমানের হাতে! ১৯৪৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত মন্দিরের ম্যানেজার ছিলেন মুন্নু মিঞা। আরতির সময় লোক কম পড়লে মুন্নু নিজেই করতাল বাজাতে দাঁড়িয়ে পড়তেন। আবার ভাবতে হচ্ছে অযোধ্যার সত্য কোনটা আর মিথ্যা কোনটা!

অগ্রবাল মন্দিরের সমস্ত ইটে আরবিতে '৭৮৬' লেখা। এই মন্দিরের সমস্ত ইট সরবরাহ করেছিলেন, রাজা হুসেন আলি খাঁ। মন্দির নির্মাতা অগ্রবালরা পাগল, না রাজা হুসেন আলি বদখেয়ালি! কোনটা সত্য? এই মন্দিরে প্রার্থনার জন্য যে হাত ওঠে, তা হিন্দুর না মুসলমানের তা বলা মুশকিল। ৭৮৬ সংখ্যাটি থাকায় এই মন্দির সকলকে আপন করে নিয়েছিল। তাহলে কি শুধু ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখটাই সত্য! সেই দিনটার পর সরকার বেশিরভাগ মন্দির অধিগ্রহণ করেছে। এখন সেখানে তালা, বন্ধ আরতি। লোকের আনাগোনা স্তব্ধ। বন্ধ দরজার পিছনে বসে দেব-দেবীরা বোধহয় ধিক্কার দিচ্ছেন তাদের, যারা গম্বুজে চড়ে রামের দখল নেবার চেষ্টা করেছিল! জনশূন্য হনুমান মন্দির, সীতা রসুই কী আজ ভরে থাকে রক্তের গন্ধে, যা রামের নাম করে বইয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশজুড়ে! অযোধ্যা এমন এক শহর যা আজ শুধু এক সমস্যার নামে পর্যবসিত। অযোধ্যা আজ এক সংস্কৃতি ধ্বংসের ইতিবৃত্ত।

—বিবেক কুমার (সোশাল মিডিয়াতে প্রাপ্ত, হিন্দি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে)

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১১)

অনন্য গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এ বিদ্যাসাগর ধারালো যুক্তির কথা লিখেছেন। যে যুক্তি সম্পর্কে অন্তত প্রকাশ্যে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলতে পারেননি, কোনও সংশয়-সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের যুক্তি কোনও ভাবে খণ্ডন করতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ, বিদ্যাসাগর শুধুই যুক্তি তোলেননি। শুধুই মানুষের মগজের দরবারে করাঘাত করেননি। যুক্তির সাথে সাথে একজন জাতশিল্পীর মতো পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করতে চেয়েছেন। পাঠকের হৃদয়ের কোমলতাকে সকরুণ পরশে সঞ্জীবিত করেছেন তিনি। বাল্যবিধবাদের সীমাহীন দুর্দশায় তিনি নিজে যেমন কেঁদেছেন, সেই কান্নাকে অন্যের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে। সেই লেখা পড়লে আজও বিদ্যাসাগরের বুকের ভেতরকার কান্না শোনা যায়।

সেখানে আছে বিদ্যাসাগরের করুণাঘন আর্তি— "হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! ...হতভাগ্য বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। ...কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহে। ...হায়, কী পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।" এই আবেদন তৎকালীন সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ধর্ম-বর্ণের নানা অত্যাচারে নির্যাতিতা নারীর অন্তর্বেদনা সমাজের মূলস্রোতে বিশেষ ভাবে আলোচ্য হয়ে উঠেছিল। কাব্য-নাটক-সঙ্গীত সহ নানা শিল্পমাধ্যমেও তা বিষয় হিসাবে উঠে

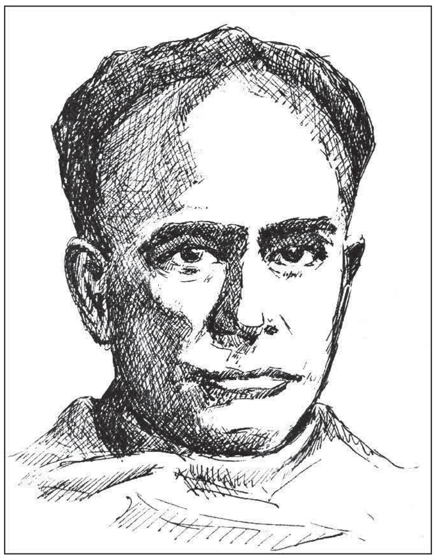

এসেছিল। এর অসংখ্য উদাহরণ আছে।

কর্মের সাথে যদি সামাজিক উদ্দেশ্য যুক্ত হয় সে-কর্মের শিল্পস্তরে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। বিদ্যাসাগরের গদ্য সেই কারণেই এত কার্যকরী, এত অমোঘ, এত সুন্দর। তাঁর 'সীতার বনবাস' হয়তো অনেকে পড়েননি, কিন্তু বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' উপন্যাস পড়েছেন। সেখানে দেখা যায়, শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শ্রুতিলিখন দিচ্ছেন 'সীতার বনবাস' থেকে— "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরপটল সংযোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত— অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"

বিষয়োপযোগী ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর রেখে গিয়েছেন এক উজ্জ্বলতর দিক-নির্দেশিকা। যখন যা লিখেছেন, সেই বিষয় ও তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের রচনাবলিতে চোখ রাখলেই তা দেখা যাবে। এমনকি ভাগে ভাগে 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫) যখন লিখেছেন তখন তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন তিনি। দীর্ঘকালের শোনা কথা, 'মিথ্যা বোলো না। মিথ্যা বললে ঠাকুর পাপ দেয়।' আজও একথা শোনা যায়। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়ে' বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'মিথ্যা বলিও না। মিথ্যা বলিলে তোমাকে কেহ ভালবাসিবে না।' আমাদের লক্ষ করতেই হয় যে, এর মধ্যে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। একদিকে অতিপ্রাকৃত সত্তাকে অস্বীকার করা। অপর দিকে, নিছক পাপপুণ্যের বায়বীয় ব্যাপার নয়, মিথ্যা বলা-না-বলার সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের কোমল আকর্ষণকে যুক্ত করে দেওয়া। —এই দুটি দিক এসেছে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নবজাগরণের দৃষ্টিভঙ্গি। সে-যুগে বিদ্যাসাগর যে বাকি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তা এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। তাই, বাংলা গদ্য— যা জন্মাবার পর বিকশিত হওয়ার রাস্তা পাচ্ছিল না, এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর সেই মহাপথ নির্মাণ করেছেন।

আবার, এই বিদ্যাসাগরই যখন প্রতিপক্ষের কুযুক্তিকে নির্দয় ভাবে কষাঘাত করছেন, তখন তার যোগ্য ভাষাও তিনি নিদর্শন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস' ইত্যাদি তাঁর এই ধরনের বিশেষ লেখার দৃষ্টান্ত। ভাষার বিবর্তনের দিক থেকে যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আক্ষরিক অর্থেই অপরিমেয়। আধুনিক বাংলা ভাষা ও গদ্যরীতি গঠনকালের সেই একেবারে সূচনাপর্বেই উইট-হিউমার-স্যাটায়ার ইত্যাদি রচনায় যে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর বিদ্যাসাগর রেখে গেছেন, এক কথায় তাকে অনন্য হিসাবে অভিহিত না করে কোনও উপায় নেই।

কালানুক্রমে নানা লেখায়, ভাষার নানা ব্যবহারে, বারবার ভাষাকে আরও সহজ, আরও সরল করে তোলার ধারাবাহিক এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা উচ্চস্তর পর্যন্ত তিনি নিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর একক অবদানকে আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করতে পারেননি, এমনকি তাঁর কতিপয় অতিবড় সমালোচকও তা পারেননি। কেউ কেউ সে অপচেষ্টা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের ভাষাকে 'কঠিন' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তারা 'কঠিন ভাষা'কে 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপপ্রচারও চালিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "...আমরা যদি তাঁর (বিদ্যাসাগরের) সমকালীন লেখকদের রচনার পাশাপাশি রেখে দেখি, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করব, তাঁর ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। অণ্বয়গুণে প্রতিটি বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট শুধু তাই নয়, বিন্যাস-কৌশলে বাক্যগুলি সুললিত। বিষয়ের অনুরোধে স্থানে স্থানে তাঁকে গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে লালিত্য ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং সন্ধি-সমাসের জটিলতায় অর্থ আচ্ছন্ন হয়নি।" প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরী রীতি' লইয়া কিছু ভুল বোঝাবুঝি চলিয়া আসিতেছে। এই ভুলের উৎপত্তি তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) সমকালে, আর এই রীতিকে যাঁহারা ভুল বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন। দুরূহ ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে গঠিত জবুথবু বাক্যকে যেন তাঁহারা 'বিদ্যাসাগরী রীতি' মনে করেন। ইহা অপেক্ষা ভুল আর কিছু হইতেই পারে না। প্রসাদগুণে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ লেখক কয়জন? 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ কিছু বেশি— কিন্তু সে বস্তুমাহাত্ম্যে। তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ মিশাইতে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ কয়জন?" এরপর তিনি লিখেছেন চমৎকার, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্যাসাগরী রীতি' নামে একটি ভাষারীতি আছে, বা বলা উচিৎ এক সময় ছিল— এই রীতির প্রধান লক্ষণ দুরূহ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। এখন, এই রীতি আর যাঁহার রচনাতেই পাওয়া যাক, বিদ্যাসাগরের রচনায় কখনো পাওয়া যাইবে না। উহা কেন যে তাঁহার নামে চলিল জানি না। বিদ্যাসাগরের ভাষা ও স্টাইল বিষয়ানুগ, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, মার্জিত ও সুললিত। সর্বোপরি তাঁহার ভাষারীতি একটি নয়, অন্ততঃ তিনটি। সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি এক রীতিতে লিখিত, বিতর্ক পুস্তিকাগুলি অন্য রীতিতে লিখিত, আর আত্মচরিত তৃতীয় রীতির অন্তর্গত।"

বাস্তবিকই, অসমাপ্ত 'আত্মচরিত'-এ বাংলা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে বিশেষ নজর দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখের দাবি রাখে। একদিকে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় অসাধারণ ভাষায় ব্যক্ত হয়, অন্যদিকে কলমের দুয়েকটা আঁচড়ে, দুয়েকটা টানে একেকটা চরিত্র কেমন জীবন্ত করে তোলা যায়, তারও উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। প্রখ্যাত ভাষাবিদ অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযথ গ্রহণ-বর্জন করিয়া সাহিত্যের ও সংসারকার্যের সব রকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইলেন।" (চলবে)

কর্মাটাঁড়ে বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মদিবসে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ২২ জনের প্রতিনিধি দল গত ২৬ সেপ্টেম্বর গিয়েছিলেন কর্মাটাঁড়ে। বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাথে জড়িয়ে আছে কর্মাটাঁড়। সেখানে বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যার্পণ করেন শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। তারপর মঞ্চের দুই সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত, শিক্ষাবিদ মহীদাস ভট্টাচার্য সহ সকলেই পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। 'বিহার বাঙালি সমিতি' ও 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি, কর্মাটাঁড়'-এর সদস্য ও পরিচালকদের কাছ থেকে কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নানা অজানা ঘটনা শোনেন তাঁরা।

বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে আলোচনা-পর্বের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা অর্চনা ব্যানার্জী। আলোচনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মানস জানা। কর্মাটাঁড়ে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সদস্যদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী এবং পশ্চিমবঙ্গে মঞ্চের কর্মকাণ্ডের পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

মঞ্চের সদস্যরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন।

কর্ণাটকে বাঙ্গালোরে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল সায়েন্সেস-এ ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভায় গবেষকরা

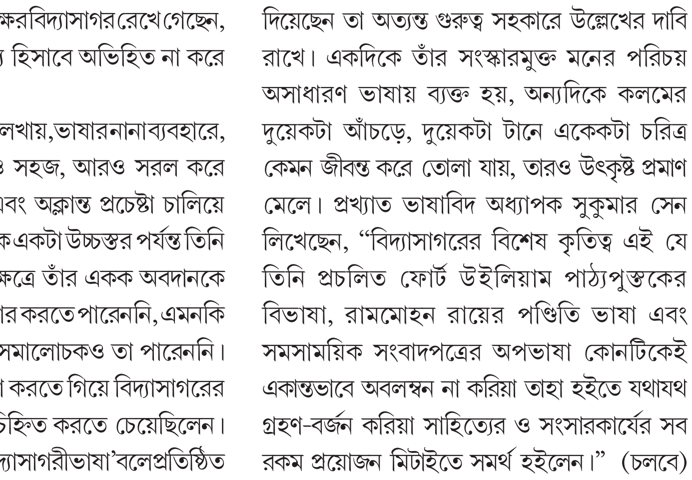

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

২৫ সেপ্টেম্বর আসানসোলে এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলার সমস্ত বন্ধ উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো অবিলম্বে খোলা, জেলার সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ করা, বন্ধ কারখানার জমিতে সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্প স্থাপন করা, কয়লা শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ রোধ, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার করপোরেটাইজেশন ও অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বিক্রি রোধ ও সমস্ত বেসরকারি কারখানার শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই, পেনশন, এবং ওভারটাইমের দাবি সহ প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল প্রথা প্রবর্তন ও মদ নিষিদ্ধকরণ সহ ১১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী।

শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও কাটমানি নেওয়ার প্রতিবাদে, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা দেওয়া এবং বেহাল রাস্তা সারানোর দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন হয়। শতাধিক মহিলা ও পুরুষ এতে সামিল হন।

সহদেব কয়ালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেন। প্রধান দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন ও সেগুলি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ ঘোষ, হাকিম আলি, মাধবী প্রামাণিক ও সুবীর দাস।

স্বীকৃতির দাবি পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের

পশ্চিমবঙ্গে ১২৮টি পৌরসভা ও নিগমে কর্মরত প্রায় দশ হাজার পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। বেতন মাত্র ৩১২৫ টাকা। জননী সুরক্ষা, টিকাকরণ, শিশুদের সুরক্ষা, বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধকের ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম করার কথা থাকলেও বর্তমানে এই কাজের পরিধি দিনের পর দিন বাড়ানো হচ্ছে। পৌরসভার কাজ, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজ এবং ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন-এর কাজ করানো হচ্ছে তাঁদের দিয়ে। বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষের বিশেষত মহিলা ও শিশুদের থেকে এপিএল তালিকাভুক্ত মানুষের কাছেও বর্তমানে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি করেনি।

২১ সেপ্টেম্বর সুডায় (স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি) ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয়, ১) মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে মান্যতা দিয়ে কাজের বয়স ৬৫ বছর পর্যন্তই করতে হবে, ২) স্বেচ্ছাসেবী নয়, কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, ৩) সাম্মানিক ভাতা নয়, পদ অনুযায়ী সম্মানজনক বেতন দিতে হবে, ৪) ইপিএফ, পেনশন এবং অবসরে এককালীন তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে, ৫) প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, ৬) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পদোন্নতি চালু করতে হবে, তারপরে শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে, ৭) জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করতে সাবসেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো, আধুনিকীকরণ, ওষুধ এবং প্রতিষেধক টিকার পর্যাপ্ত সরবরাহ করতে হবে।

সুডা ডিরেক্টর জানান, গ্র্যাচুইটির দাবি মেনে নিয়ে অর্থ দপ্তরে সুপারিশ করার জন্য পৌরমন্ত্রীর কাছে ফাইল পাঠিয়েছেন। ট্রেনিং শুরু করবেন অক্টোবর থেকে। বেতন বৃদ্ধি ইনসেনটিভের মাধ্যমে বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

৩৪বি বাস নতুন রুটে চালানোর দাবিতে

বরানগরে নাগরিক কনভেনশন

উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজ দীর্ঘ দু'দশক ধরে সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। সম্প্রতি এই ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মূল কলকাতায় যাতায়াত খুবই সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা সমাধানে এক গুচ্ছ বিকল্প প্রস্তাব তুলে ধরে আন্দোলনে নেমেছে বরানগর নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি।

১২ অক্টোবর জিএলটি রোড-টবিন রোড মোড়ে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে সমিতির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, টালা ব্রিজ মেরামত না হওয়া পর্যন্ত ৩৪বি বাস ডানলপ-কাশীপুর-রাজবল্লভপাড়া-শ্যামবাজার-ধর্মতলা রুটে চালানো হোক। বর্তমানে এই বাসটি ডানলপ-বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে-হাডকো-ফুলবাগান-কাঁকুরগাছি-বেলেঘাটা-শিয়ালদা-ধর্মতলা রুটে চলছে। এই রুট বরানগরবাসীর কোনও কাজে লাগছে না। বাসকর্মচারী ও বাসমালিকদের স্বার্থও এই রুট রক্ষা করছে না। বেশিরভাগ গাড়ি বসে যাওয়ায় বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাকটররা তাঁদের দুরবস্থার কথা সভায় তুলে ধরেন। সমিতির আরও দাবি, ডানকুনি-শিয়ালদহ লাইনে প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ট্রেন চালাতে হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কুটিঘাট-বাগবাজার লঞ্চ সার্ভিস চালু করতে হবে, বাড়াতে হবে নোয়াপাড়া থেকে মেট্রো রেল সার্ভিস। এছাড়া ৩৪সি রুটটিও চালু করার দাবি উঠেছে।

দাবিপত্রে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৩ অক্টোবর বরানগর পৌরসভা অভিযানের কথা জানান সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। এই কনভেনশন সফল করার জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ অরুণকান্তি বিশ্বাস, ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন ভট্টাচার্য, জাতীয় ফুটবলার ত্রিজিত দাস, সাংবাদিক প্রসুন আচার্য, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ ৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নাগরিক সভার পাশেই বিপ্লবী বাঘাযতীনের আবক্ষ মূর্তি দুষ্কৃতীরা ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে সভায় নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আশা কর্মী ইউনিয়নের সম্মেলন

আশাকর্মীদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা মাসিক বেতন, পি এফ, বোনাস এবং ইএসআই চালু, দিশা ডিউটি বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের নকশালবাড়ি ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব হলে। সম্মেলনের আগে দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ব্যানারে সজ্জিত মিছিল পানিঘাটা মোড় থেকে শুরু হয়ে নকশালবাড়ি বাজার পরিক্রমা করে। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ জয় লোধ। সভাপতিত্ব করেন বনানী সাহা। পলি আচার্যকে সভাপতি এবং ফাল্গুনী বর্মন ও সীমা সরকারকে যুগ্ম সম্পাদক করে ২৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com